গল্পের শহরে

তপন দেবনাথ

প্রচন্ড গতিতে একটি খালি রিক্সা এদিকেই আসছে। এমন জোরে জোরে সে প্যাডেল মারছে যে পারলে উড়ে যায় আর কি। এত জোরে শহরে রিক্সা চালানো তো দূরের কথা অফিস টইমে ফুটপাত ধরে হাটার জো থাকে না। মানুষ আর মানুষ। ঢাকা শহরে এত লোক কোত্থেকে এলো? কোন পরিসংখ্যানবিদও সঠিক করে বলতে পারবে না ঢাকা শহরে এখন কত লোকের বাস। বলা যায় জনসমুদ্রের শহর ঢাকা।

অনেক্ষণ পর্যন্ত রিকসা-গাড়ি নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথ্যা করছে যতীনের। দু'একটি রিক্সা-গাড়ি যা-ও আসছে তাতে উঠার সুযোগ পাচ্ছে না সে। তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছে। যেন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে প্রাণান্ত ছুটে চলা। এই সকাল বেলা, কর্ম দিবসে ঢাকা শহরের এমন হতাশাগ্রস্থ চিত্র নিকট অতীতে আর দেখা যায়নি। সময় মত গাড়ি-রিক্সা না পাওয়া বা সময় মত গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারা ঢাকা শহরের একটি নিয়মিত ব্যাপার। উর্ধ্বশ্বাসে খালি রিক্সাওয়ালাকে ছুটে আসতে দেখে একটু আশার আলো দেখলো যতীন। কোন রকমে এখান থেকে একটু যেতে পারলে হয়। বেটা আর কত ভাড়া চাইবে? দশ টাকার ভাড়া না হয় একশো টাকা চাইবে।

-এই যে খালি বলে যতীন ডান হাত মাথার উপর তুলে রিক্সাওয়ালার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যতীনের কাছাকাছি এসে রিক্সাওয়ালা সমান গতিতে সামনের দিকে চালিয়ে যাচ্ছে। উপস্থিত লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলছে "যুদ্ধ লাগছে যুদ্ধ। পালান সবাই।" সে নিজে পালাচ্ছে তার রিক্সা নিয়ে। উপস্থিত সবাই যারা রিক্সাওয়ালার কথা শুনেছে তারা পরস্পর সন্দেহের দৃষ্টিতে একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকালো। এরা অপেক্ষা করছে রিক্সা বা গাড়ির জন্য। এসময় সাধারণত কর্মস্থলে যাবার লোকের সংখ্যাই বেশি থাকে।

যতীন ভ্যাবাচেকা হয়ে গেল রিক্সাওয়ালার কথা শুনে। লোকটা কি শুনতে কি শুনেছে। কোথাও হয়তো কোন গণ্ডগোল লেগেছে। এটা এ শহরের চিরচেনা ঘটনা। তাই বলে যুদ্ধ তো আর হতে পারে না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজধানীতে কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? উদ্ভট কথাবার্তা যতসব।

গুলির শব্দ শোনা গেল। কোন দিকে হতে পারে? শব্দ তো দেখার জিনিস নয়। শোনার

তপন দেবনাথ

জিনিস। শুনে স্থির করা কোন দিক থেকে শব্দ আসছে। সবাই যেন দেখার চেষ্টা করছে শব্দ কোন দিক থেকে আসছে। হতচকিত ভাব। কর্মস্থলে যেতে না পেরে কে কোথায় যাবে কেউ জানে না।

আবার গুলির শব্দ। ঠ্যা ঠ্যা ঠ্যা। কালো ধূয়া। কোন দিকে? দক্ষিণপূর্ব দিকে। এবার পরিস্কার বোঝা গেল কালো ধূয়া দেখে। ঐদিকে তো বিডিআর হেড কোয়ার্টার্স। তাহলে কি ঐখানেই যুদ্ধ চলছে? যুদ্ধ চলবে কেন? তাহলে এত গুলির শব্দই বা কেন?

-এই যে ভাই, ঐদিকে এত গুলির শব্দ কেন বলতে পারেন? একজন বললো আর একজনকে।

-বিডিআর সপ্তাহ চলছে তো, বিডিআর'রা মনে হয় কুচকাওয়াজ করছে।

-তাই বলেন। স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললো প্রশ্নকারী।

দু'জনের কথা শুনে যতীনও একটু স্বস্থি পেলো। কুচকাওয়াজই হবে হয়তো। নতুবা এই সকাল বেলা, কর্ম দিবসে, বিডিআর হেড কোযাটার্সে কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? কেন করবে?

-কিন্তু রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা কেন বলুন তো? রিক্সা-গাড়িগুলো গেল কোথায় সকাল বেলা? প্রশ্নকারীর প্রশ্ন।

-কুচকাওয়াজে অংশ নিতে গেছে হয়তো। হোঃ হোঃ শব্দ করে হাসলো প্রশ্নকারী এবং উত্তরদাতা দু'জনেই। যতীন হাসলো মৃদু, কোন শব্দ হলো না তার হাসিতে।

আবার গুলির শব্দ। এক, দু'তিন, চার পাঁচ...। একের পর এক। থেমে থেমে। রাস্তাঘাট ক্রমান্বয়ে ফাঁকা হয়ে আসছে। একাত্তরের উত্তাল দিনের কোন সকাল নয়। দু'হাজার ন'সালের পঁচিশে ফেব্র"য়ারি বুধবারের সোনালি সকাল।

সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়। অদূরেই নীলক্ষেত বই এর দোকান। এক আংকেলের জন্য একটি পুরনো বই কিনতে হবে। পাঠাতে হবে আমেরিকার ফ্লোরিডা। নীলক্ষেতই হচ্ছে বইটি পাবার সম্ভাব্য স্থান।

বাসা থেকে বের হয়েই যতীন দেখলো দেয়াল ঘেঁষে একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সা রেখে গদিতে বসে সীটের উপর পা তুলে সিগারেট ফুকছে।

-যাবেন ভাই নীলক্ষেত?

-যাব। রিক্সাওয়ালা গদি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়ালো। হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অবশিষ্টাংশ পায়ের তলায় পিষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো

-পঞ্চাশ টাকা দিয়েন স্যার।

শুভ সকাল। সকালটা ভালোই শুরু হলো। কোথাও যেতে চাইলে কোন রিক্সাওয়ালা যদি একবারেই রাজী হয় সেটাকে সৌভাগ্য বলতেই হবে। বারো মিলিয়ন লোকের জন্য বড় জোর হাফ মিলিয়ন রিক্সা?

-আফ-ডাউন কত নিবেন? আমি শুধু একটা বই কিনবো। যতক্ষণ লাগে। এক দোকানে পেয়ে গেলে তো কথাই নেই।

-কত দিবেন আর, একশো দিয়েন। বেশি দেরি হইলে একটু বাড়াইয়া দিয়েন স্যার।

-না, না, দেরি করবো না। বই পেয়ে গেলে আর দেরি করবো কেন? আমার অন্য কাজ আছে না?

রিক্সায় উঠে বসলো যতীন। রিক্সাওয়ালা মাঝায় গামছা শক্ত করে বেঁধে রিক্সা চালাতে আরম্ভ করলো নীলক্ষেতের উদ্দেশ্যে। সাইন্স ল্যাবরেটরী মোড়ে আসার পর রাস্তা-ঘাটে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা গেল। রিক্সাওয়ালা কি বুঝল কে জানে। সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে এসেই সে আর যাবে না বলে রিক্সা দাঁড় করালো। এক রকম জোর করে যতীনকে রিক্সা থেকে নামিয়ে, ভাড়া না নিয়ে, কোন প্রকার তর্কবিতর্ক না করেই এক প্রকার পালিয়ে গেল রিক্সাওয়ালা। সে যে কি বুঝেছে সেটা কেবল সে-ই জানে।

বাকী পথটুকু যাবার জন্য যতীন সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে অপেক্ষা করছে। ক্রমেই রাস্তা-ঘাট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। লোকজন দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছে। ঢাকা শহরে এমন অবস্থা মাঝে মাঝেই হয় তবে তা আগে ভাগেই লোকজনের জানা থাকে বিশেষ করে হরতাল-মিছিল বা কারফিউর সময়। আজকের সকালের অস্বাভাবিকতা একেবারেই অজানা।

প্যান্টের পকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। ভাগ্নের নাম্বার। হ্যালো বলতেই ভাগ্নের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

-মামা আপনি এখন কোথায়?

-আমি সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। তোমাকে এত অস্থির লাগছে কেন?

-আপনি জানেন না কিছু?

-না তো। কী হয়েছে?

-বিডিআর হেড কোয়াটার্সে গোলাগুলি চলছে। তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসেন। আপনার না নীলক্ষেত যাবার কথা? সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে কি করছেন?

-তাই তো যাচ্ছিলাম। রিক্সাওয়ালা আমাকে এখানে জোর করে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছি।

-দ্রুত ঐ এলাকা ত্যাগ করেন মামা। যেকোন সময় কারফিউ দিতে পারে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ। নীলক্ষেত যাবার দরকার নেই।

-আচ্ছা ঠিক আছে। এত অস্থির হবার দরকার নেই। আমি ঠিক চলে আসতে পারবো।

মোবাইলটা পকেটে রেখে দিল যতীন। এবার আসলেই ভাবার বিষয়। কি করে বাসায় ফেরা যায়। একের পর এক গুলির শব্দ আসছেই।

একটু পরেই বিদ্যুত গতিতে উত্তর দিক থেকে একটার পর একটা আর্মির গাড়ি আসতে লাগলো। পিছনে ট্রাক্স, কামান। মাথার উপর হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। যুদ্ধ, যুদ্ধভাব। রাস্তা-ঘাট ইতিমধ্যেই প্রায় জনশূণ্য হয়ে গেছে। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই।

আমি কি উদ্বিগ্ন? ভয় পেয়ে গেছি এসব অনাকাংখিত অবস্থা দেখে? বাংলাদেশকে কি বাইরের কোন শত্র" আক্রমণ করলো? তারা বিডিআর হেড কোয়ার্টার্স দখল করে নিয়েছে? এই দুপুরের মধ্যেই কি ঢাকার পতন ঘটবে? ঢাকা আবার হয়ে যাবে কোন করদ রাজ্যের রাজধানী? মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে যতীনের।

ভয়ঙ্কর একটা কিছু যে ঘটেছে এতক্ষণে তা পরিষ্কার হয়ে গেল যতীনের কাছে। এবার ভালোয় ভালোয় জীবনটা নিয়ে বাসায় ফিরতে পারলে হয়। কিন্তু কোন দিকে নিরাপদ? কোন দিকে গেলে নিরাপদে বাসায় ফিরতে পারবে? চির চেনা ঢাকা শহরকে মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে এমন ভয়ঙ্কর শহর বলে মনে হচ্ছে কেন তার? মৃত্যুকে এত কাছাকাছি মনে হচ্ছে কেন?

এখান থেকে বাসায় যেতে হলে গুলিস্তান হয়ে যাওয়াই ভালো।

গুলিস্তানও এখান থেকে কম দূরে নয়, তবুও কি করা। আরো কিছুদিন বাঁচতে হবে। সময়টা উনিশশো একাত্তর নয়, দু'হাজার নয় এর পঁচিশে ফেব্র"য়ারি। সোনালি সকালটা কি করে যে ভয়ঙ্কর সকালে রূপ নিলো কে জানে।

মাথার উপর দিয়ে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। ট্রাঙ্ক, কামানগুলো যাচ্ছে বিকট গর্জন করে। একের পর এক গুলির শব্দ, আকাশে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সময়টা একাত্তর হলে তেমন কিছু বলার ছিল না। পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ বলে ধরে নেয়া যেত। যতীনের ইচ্ছে করে এখানে অবস্থান করে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে ঘটনাগুলো দেখে। কিন্তু নিজের জীবন? এই মুহূর্তে নিজের জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই।

পকেটে মোবাইল বেজে উঠল। ভাগ্নের নাম্বার। হ্যালো বলতেই ভাগ্নের কম্পিত কণ্ঠস্বর "মামা যে কোন মুহূর্তে আর্মিবিডিআর যুদ্ধ শুরু হতে পারে। আপনি তাড়াতাড়ি ঐ এলাকা ত্যাগ করেন। টিভিতে খবর বলছে।

-আমি গুলিস্তানের দিকে হাটতে আরম্ভ করেছি। চিন্তা করো না। ঠিক এসে যাবো।

গল্পের শহরে

-আমি কি গুলিস্তান পর্যন্ত আসবো হোন্ডা নিয়ে?

-না, তার দরকার নেই। আমি আসতে পারবো।

মোবাইলটা পকেটে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে যতীন গুলিস্তানের দিকে হাটতে আরম্ভ করলো। কেউ একজন বোধহয় যতীনকে অনুসরণ করছে। আসলে তা নয়। সে-ও হাটছে। যে, যে যার, যার মত করেই হাটছে।

পিছন ফিরলো যতীন। মধ্য বয়স্ক, শাড়ি পরিহিতা একজন রমনী যতীনের সমান সমান হাটতে চেষ্টা করছে। যতীনের মতো সে পেরে উঠছে না। একটু আগেও যতীন এ মহিলাকে সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। হতে পারে রিক্সা গাড়ি না পেয়েই হাটতে আরম্ভ করেছে। হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। অথবা আরো অনেক কিছু হতে পারে।

যতীন হাটছে। রাস্তার দিকে কড়া নজর রাখছে যদি একটা খালি রিক্সা সৌভাগ্যক্রমে পাওয়া যায়। রিক্সাওয়ালা যা ভাড়া চাইবে তাতেই সে রাজী হবে। পরিস্থিতি খুবই খারাপ মনে হচ্ছে।

-এই যে ভাই একটু আস্তে হাটবেন? মহিলার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

কেন বলুন তো? যতীন হাটার গতি একটু কমালো।

-না, এমনিতেই। আপনাকে অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ফোনে কথা বলার পরই দেখলাম আপনি দ্রুত হাটতে আরম্ভ করলেন। আপনি কি কিছু খবর পেয়েছেন আজকে এমন অবস্থা বিরাজ করছে কেন?

-সত্য মিথ্যা তো কিছু জানি না, ভাগ্নে ফোন করে বললো বিডিআর হেড কোয়ার্টার্সে আর্মি বিডিআর গোলাগুলি চলছে। যুদ্ধ লাগতে পারে। কারফিউ দিতে পারে। তাই দ্রুত এ এলাকা ত্যাগ করতে বলেছে।

-আপনার কি মনে হয় এমন কিছু ঘটছে?

-সঠিক তো কিছু জানি না। তবে মনে হয় একটা কিছু ঘটছে। তা না হলে এই সকাল বেলা এমন অস্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজ করবে কেন? দেখেন না রাস্তাঘাট কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কতগুলো আর্মির গাড়ি গেল। ট্রাঙ্ক, কামান যাচ্ছে সমানে। হেলিকপ্টারগুলো কেমন করে চক্কর দিচ্ছে। মনে হয় বিরাট একটা কিছু ঘটেছে।

-আমারও তাই মনে হয়। বাসা থেকে বের হয়ে রিক্সা টেম্পু কিছুই না পেয়ে হাটতে হাটতে সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে এলাম। ভাবলাম এখান থেকে একটা না একটা কিছু পাওয়া যাবেই। এসে দেখি কিছুতেই উঠতে পারছি না। মানুষের মধ্যে কেমন যেন অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমিও কিছু না বুঝেই হাটতে শুরু করলাম। কোথায় যাবেন আপনি?

-যাবো তো স্বামীবাগ। আপাতত গুলিস্তান পর্যন্ত যেতে পারলে হয়।

-আপনি কোথায় যাবেন? যতীন জিজ্ঞাস করলো।

-আমি গুলিস্তান হয়ে সদরঘাট যাব। আপনাকে পেয়ে ভালোই হলো। একসাথে অন্তত গুলিস্তান পর্যন্ত যাওয়া যাবে। আমি আপনার সাথে গেলে বিব্রত বোধ করবেন না তো?

-না, না তা করবো কেন? আপনার যাওয়া আপনি যাবেন, আমার যাওয়া আমি যাব। আপনি তো আমার পিঠে চড়ে...। কথাটা শেষ করলোনা যতীন। পিঠে চড়ার কথাটা কেমন যেন অভদ্র লাগছে।

-কোথায় যাচ্ছিলেন এদিকে? মহিলা বললো।

-আর বলবেন না, যাচ্ছিলাম নীলক্ষেত পুরনো একটা বই কিনতে। স্বামীবাগ থেকে আপ-ডাউন একটা রিক্সা নিলাম। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড়ে এসে বললো আর যাবো না। আমি বললাম কেন, কেন যাবে না? লোকটা কেন তর্ক-বিতর্ক না করে আমাকে এক প্রকার জোর করে নামিয়ে দিয়ে ভাড়া না নিয়েই দ্রুত চলে গেল। আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। বেটা যে কি বুঝলো তা সে -ই জানে। আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না। কি অবিচার বলুন তো। বেটা যদি তুই কিছু বুঝে থাকিস তো আমাকে বললেই পারতি। আমাকে ছেড়ে দিয়ে বেটা নিজের জান নিয়ে পালালো।

- এই শহরে রাস্তা ঘাটে কোন অঘটন ঘটলে রিক্সাওয়ালারাই প্রথম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ওরা তো সারাদিন রাস্তায়ই থাকে। আমার মনে হয় পরিস্থিতি দেখে ও কিছুটা বুঝতে পেরেছে। তাই হয়তো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে।

-আপনার অনুমান সত্যিই হতে পারে। তাই বলে ভাড়াটা নিবে না? ওর আচরণে মনে হলো, যে অস্বাভাবিকতা আঁচ করেছে আমিই বুঝি তার নায়ক। আপনার নামটা কিন্তু জানা হলো না। আমার নাম যতীন। স্বামীবাগ এক ভাগ্নের বাসায় থাকি আপাতত।

-আমার নাম শাপলা। শাপলা রায়।

-হতেই হবে। শাপলা না হয়ে জুঁই বা চামেলী হবার কোন সুযোগ নেই।

আমি যদি যতীন ভৌমিকই হই তবে তুমি শাপলা রায় না হয়ে উপায় কি?

-যতীন তুমি? এত ভূমিকার পর পরিচয় দিলে?

-কোন একজন মধ্যবয়সী সুন্দরী রমনীকে দেখে আমি কি বলতে পারি আমি যতীন ভৌমিক, আপনি কি শাপলা রায়? তিনি যদি শাপলা না হয়ে মাধবী, সুরভী বা পূরবী হন তাহলে বলবে না ইয়ার্কির জায়গা পান না? তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল তুমি শাপলা হতে পারো। কয়েকবার তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম তোমার অলক্ষ্যে।

-তোমার মুখটা আমার চেনা চেনা মনে হয়েছিল কিন্তু স্মরণ করতে পারছিলাম না।

-তা তো হবেই। শেষ দেখা ১৯৯২ তে কবি নজরুল কলেজে। আজ ২০০৯। মাঝে পার হয়ে গেছে সতের বছর। কী করে মনে থাকবে? যাচ্ছিলে কোথায়?

-সদরঘাট। একটা বীমা কোম্পানীতে চাকরি করি।

-আজ কি অফিসে না গেলেই নয়?

-না গেলে নয় কেন? আজ তো হরতাল, মিছিল বা অন্য কোন প্রোগ্রাম নেই। অন্যদিনের মতোই একটি দিন। আগে থেকে তো কিছুই জানিনা যে সাবধান হবো।

যতীন ও শাপলার মধ্যে পরিচয় হবার পর তারা খুব কাছাকাছি হয়ে ফুটপাত ধরে নিউ মার্কেটের দিকে হাঁটছে। বিডিআর হেড কোয়াটার্স থেকে থেমে থেমে গুলির শব্দ আসছে। হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর দিচ্ছে। রাস্তাঘাটে লোকজন তেমন নেই। যারা ঘর থেকে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েছিল তারাই বোধহয় আবার ঘরে ফেরার চেষ্টা করছে। অন্যদিন এ সময়ে এখানে এমন জনশূণ্যতা চিন্তাও করা যায় না।

-কোথায় থাক যতীন, কী করা হয়? বিয়ে সাধি তো করেছো বোধহয়? ছেলেমেয়ে ক'জন?

-আপাতত এক ভাগ্নের কাছে আছি। বিয়ে করেছি। দু'সন্তান। এখানে কিছু করছি না। তোমার অবস্থা কি?

-কপালের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে যে বিয়েটা হয়ে গেছে। ৩ ছেলে মেয়ে। স্বামী ব্যাংকে চাকরি করে। মোটামুটি ভালো আছি। মধ্যবিত্ত জীবন যাপন।

হাঁটতে হাঁটতে যতীন ও শাপলা নিউ মার্কেট চলে এলো। কোন কোলাহল নেই নিউ মার্কেটে। দোকান পাট সব বন্ধ। দু'একটা দোকানে লোকজন আছে। তারা পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। ফুটপাত ধরে দু'চারজন লোক হাটাচলা করছে। এ সময় নিউ মার্কেটের এ অবস্থা অকল্পনীয়। গুলির শব্দ আসছে। হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। ৫২, ৬৯ বা ৭১ নয়। ২০০৯ এর ২৫শে ফেব্রুয়ারি। রক্তঝড়া ভয়ংকর সকাল। লক্ষ লক্ষ লোকের এক অজানা আতংকের সকাল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের একাংশের সকাল।

তপন দেবনাথ

ওভারব্রীজের নীচে একজন বয়স্ক রিক্সাওয়ালা রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে আছে। তার চাহনি সতর্ক। হয়তো সে বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। যতীন প্রথম রিক্সাওয়ালাকে অলস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শাপলাকে বললো চল লোকটাকে জিজ্ঞেস করি গুলিস্তান যাবে কিনা। শাপলা সায় দিলো।

-আংকেল গুলিস্তান যাবেন?

-যামু।

-কত নিবেন?

-চল্লিশ টাকা।

যতীন শাপলার হাতে চিমটি কাটলো। এর চেয়ে সৌভাগ্যের কথা এই মুহূর্তে আর নেই। গুলিস্তান গেলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। লোকটা যে গুলিস্তান যেতে রাজী হয়েছে এটা পরম সৌভাগ্য।

ধীর গতিতে রিক্সা গুলিস্তানের দিকে চালাতে আরম্ভ করলো রিক্সাওয়ালা। শাপলার চোখে চোখ রাখল যতীন। শাপলা নির্লিপ্ত। অনুভূতিহীন।

-তুমি এখন পরস্ত্রী, আমি পুরুষ। একসাথে রিক্সায় চড়ে তোমার অনুভূতি কি শাপলা?

-কোন অনুভূতি নেই। এই শহরে এমন ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে। কত গল্প মুছে যায়, কত গল্প রচিত হয়। আজকের দিনের পর তোমার সাথে আবার কত বছর পর দেখা হবে কে জানে।

-বেশ ভালো বলেছো। এমন অজানা আতংক ঢাকা শহরে এর আগে কখনো দেখিনি। আপনি কিছু জানেন আংকেল আজকে এমন অবস্থা কেন?

-হুনছি বিডিআর লোকেরা শতে শতে আর্মি মাইরা ফালাইছে। পিলখানা যুদ্ধ চলতাছে।

-কার কাছে শুনলেন এসব কথা? যতীন আবার প্রশ্ন করলো। শাপলা চুপচাপ।

-লোকজন কইতাছে! একটু পরে কার্ফু দিবো।

-এত ভয়ানক খবর শোনার পরও আপনি বাসায় না গিয়া রাস্তায় রইলেন কেন?

-পুলিশতো কিছু কয় না। কোনডা সত্য, কোনডা মিছা কিছুই তো বুঝি না। আপনেরা কিছু জানেন?

-আমরাও তেমন কিছু জানি না। আমাদের গুলিস্তান নামিয়ে দিয়ে বাসায় চলে যান। মনে হয় ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

-এত সকালে বাসায় চলে গেলে পেট চলবে কেমনে বাবা?

রিক্সা গুলিস্তান মাজারের কাছে এসে থামলো। যতীন ও শাপলা রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো। অন্যদিনের তুলনায় গুলিস্তানে লোকজন, রিক্সা–গাড়ির সংখ্যা অনেক কম। কেউ সঠিক করে জানে না কি হয়েছে বা কি হতে যাচ্ছে।

যতীন ও শাপলা পরস্পর ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর বিনিময় করলো। যতীন রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করলো সে শাপলাকে নিয়ে সদরঘাট যাবে কিনা। রিক্সাওয়ালা রাজী হলো। শাপলা চলে যাবার পর রাস্তা পর হয়ে যতীন একটি ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকলো।

কয়েকজন লোক চা, কফি, সিঙ্গারা, সামুছা খাচ্ছে আর বিডিআর হেড কোয়ার্টারের কথা বলাবলি করছে। তারা আতংকিত, ভয়ার্ত। একজন বলছে প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিলেই আর্মি বিডিআর হেড কোয়ার্টার আক্রমন করবে। অন্যজন বললো – প্রধানমন্ত্রী এ হুকুম দিতেই পারেন না। তাহলে হাজার হাজার লোক মারা যাবে। চা পানরত মধ্যবয়সী লোকটা বললো – আর্মি গুলি করে হাজার হাজার বিডিআর মেরে ফেলেছে। সিঙ্গারা থেকে মরিচের টুকরোটি প্লেটে রেখে বাধা দিয়ে অন্যজন বললো আপনি ভুল শুনেছেন। বিডিআরের লোকেরা গুলি করে শত শত আর্মি অফিসার মেরে ফেলেছে। আর একটু পরেই বোধহয় কার্ফু দিবে। দোকানদার বললো কার্ফু দিবে কেন? হঠাৎ করে কার্ফু দিলে লোকজনের কী অবস্থা দাঁড়াবে?

একটা গোল টুল টেনে বসলো যতীন। কি খাবে তাই দেখছিল। একটা সিঙ্গারা ও এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে যতীন অন্য লোকদের কথার দিকে মনোযোগ দিলো। কফি পানরত একজন বললো এটা মৌলবাদীদের কাজ। ওরা সব জায়গায় ঢুকে পড়েছে। দেশটাকে আবার পাকিস্তান বানিয়ে ছাড়বে।

সিঙ্গারার শেষ অংশ মুখে দিয়ে না চিবিয়েই লোকটা বললো– কি যে বলেন না ভাই, সে খোয়াব ওদের জীবনেও পূর্ণ হবে না। একাত্তরেই পারলো না আর এখন পারবে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হতে যাচ্ছে জেনে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে একাজ করছে। আর্মি বিডিআরকে দিয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে পার পেয়ে যাবে মনে করেছে। এবার বোধহয় কল্লা বাঁচাতে পারবে না।

অন্যজন বললো দেখবেন ঘটনা কিছুই না। আর্মি বিডিআর একই সংস্থার লোক। তারা মারামারি করতে যাবে কেন? সব গুজব। একটা কিছু ঘটলেই লোকজন গুজব ছড়াতে আরম্ভ করে। আমি তো একটু আগে হাজারীবাগ থেকে এলাম। কৈ, আমি তো তেমন কিছুই দেখলাম না।

দোকানদার প্লেটে করে যতীনকে সিঙ্গারা দিলো। বোতল থেকে লাল রঙের টমেটো সস নিয়ে সিঙ্গারায় লাগিয়ে মুখের কাছে নিতেই কেমন যেন একটি গন্ধ এলো তার নাকে। সদ্য মৃত মানুষের তাজা রক্তের গন্ধ। আর্মি-বিডিআর-সাধারণ মানুষ-শিশু-মহিলা-পথচারির তাজা রক্তের গন্ধ।

সিঙ্গারাসহ প্লেটটি হাত দিয়ে সরিয়ে রেখে এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে পান করলো যতীন। কফির কাপে চিনি দিয়ে নেড়ে প্রথম চুমুক দিতেই মনে হলো যেন এর সাথে বিষ মিশানো হয়েছে। এতো তেতো কেন কফি? যতীনের মনে হলো আর এক চুমুক দিলেই সে বুঝি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। এই শহরে এখন মৃত্যুর হোলিখেলা চলছে। কোন বাঁধা ছাড়া কে কাকে মারবে তার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা চলছে। হিংস্র গতিতে ধেয়ে আসছে মৃত্যু।

কফির কাপটি সরিয়ে রাখলো যতীন। মাথাটা একটু ঝাড়া দিলো সে। কিছু না খেয়েই সতের টাকা বিল পরিশোধ করে যতীন দরজা ঠেলে বাইরে বের হলো। গুলিস্তান এলাকাটাকে আজ কেমন যেন অচেনা অচেনা মনে হচ্ছে তার কাছে। মনে হয় এই শহরে সে নূতন এসেছে। সবকিছু খাপছাড়া লাগছে তার কাছে।

পকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠলো। ভাগ্নের নাম্বার। রিসিভ করতেই উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা–

-মামা আপনি এখন কোথায়?

-আমি এখন গুলিস্তান।

-তাড়াতাড়ি চলে আসুন। শহরের অবস্থা খুব খারাপ।

-চিন্তা করো না, আমি পনের বিশ মিনিটের মধ্যে বাসায় পৌঁছে যাবো।

যতীন মোবাইল পকেটে রেখে দিলো। আশৈশবের চেনা শহরটা এক সকালের মধ্যেই মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হলো? কী করে? কার কারণে? ভয়ংকর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি এখন বাসায় চলে যাচ্ছি।

ভাগ্যটা ভালো বলতে হবে যে বিশ টাকার ভাড়া পঁচিশ টাকায় রিক্সাওয়ালা স্বামীবাগ যেতে রাজী হলো।

মামার জন্য ভাগ্নে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই চমকিত হলো দীপংকর।

-মামা আপনি এসেছেন…? রীতিমতো কাঁপছে দীপংকর।

-কেন, আমার কি না আসার কথা?

-ঐ দেখুন টিভিতে পিলখানা কি হচ্ছে।

টিভির পর্দায় চোখ রাখলো যতীন। ভয়ংকর সব ব্যাপার–স্যাপার। বর্ণনাতীত কাজ কারবার। রক্ত হীম শীতল হয়ে আসা সব দৃশ্য। মারদাঙ্গা কোন সিনেমার প্রিমিয়ার শো'র দৃশ্য নয়। নিরেট বাস্তবতা আর্মি-বিডিআর যুদ্ধের মুখোমুখি। একটি মাত্র হুকুম। একটি

গল্পের শহরে

হুকুমে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার হতে পারে মাত্র কয়েক মিনিটে।

উৎকন্ঠা, উদ্বিগ্নতা, চরম উত্তেজনা থেকে চরম হতাশা। ঢাকা থেকে সারাদেশ, সারাদেশ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালিদের কী ঘটতে যাচ্ছে পিলখানা? অগণিত প্রশ্ন কিন্তু কোন জবাব নেই।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম খবর ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। সে সাথে গুজব। যে যা বোঝে সে তা-ই বলছে। রাতের শেষে সকাল।

৬শে ফেব্র"য়ারি। দেশের সকল সংবাদপত্রে নারকীয় ঘটনার বর্ণনা। খবরের পর খবর। প্রায় পুরো সংবাদপত্র জুড়ে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের খবর। অসংখ্য লাশের ছবি। বিডিআর জোয়ানদের হাতে আর্মি অফিসার খুন। একজন... দু'জন... তিনজন। অগণিত, অসংখ্য আর্মি অফিসার নিহত। অনেকে নিখোঁজ। সর্বত্র কান্নার রোল। আত্মীয় পরিজনের বিনিদ্র রজনী যাপন। স্বামীর খোঁজে স্ত্রী, সন্তানের খোঁজে মা। কেউ কারো খবর জানে না। কী করে যে কী হয়ে গেল কেউ জানে না।

হত্যাযজ্ঞ চলছে। সমঝোতার চেষ্টা চলছে। দাবী নিয়ে কথা উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাকে ক্ষমা করলেন তিনি? কেন করলেন? বিডিআরদের আত্ম-সমর্পনের চেষ্টা চলছে। আর্মিরা মরছে। বিডিআর পালাচ্ছে। ধরা পড়ছে। কোনটা খবর, কোনটা খবর নয় কে জানে।

চিরাচরিত নিয়মে দিনের পর রাত। দু'চোখের পাতা একসাথে করতে পারছে না যতীন। এ কেমন পৈচাশিকতা? কোন দুনিয়ায় বাস করছি আমরা। বিডিআর জোয়ানরা আর্মি অফিসারদের হত্যা করে লাশ ম্যানহোলে ফেলে দিয়েছে। সে লাশ ম্যানহোল দিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে। গণকবর দেয়া হয়েছে আর্মির লাশ। সে সাথে মহিলাদের লাশও মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। পরনে মহিলার কোন বস্ত্র ছিল না। তাঁকে পর্দার কাপড় জড়িয়ে পুরুষ লাশের সাথে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। তাঁকে কি ধর্ষণ করা হয়েছিল? আলামত নষ্ট করার জন্য লাশ আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অস্ত্রাগার লুট করা হয়েছে। অস্ত্র নিয়ে বিডিআর জোয়ানরা পালিয়ে গেছে। আর্মি অফিসারদের বাসায় লুটপাট করা হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটছে সব। একই সংস্থার লোক দ্বারা। এক সহকর্মী দ্বারা অন্য সহকর্মীদের জীবন সংহার করা হয়েছে। কেউ জানে না কেন।

বর্বরোচিত ঘটনা? হলো না। অমানবিক? তা-ও হলো না। সভ্যতা বিবর্জিত? না, তা-ও হলো না। কাপুরুষোচিত? যুথসই হলো না। প্রতিহিংসা? কার প্রতি কার প্রতিহিংসা? রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যাদের উপর ন্যস্ত তারাই চৌকষ আর্মিদের হত্যা করে লাশের উপর উল্লাশ করেছে? তাকে প্রতিহিংসা বললে সঠিক বলা হলো? মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গুলি করার পর বেয়নেট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে আনন্দ উল্লাস করার দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এ ঘটনা কি আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? না। সে যুগেও এমন নির্মমতার বর্ণনা নেই। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে? হ্যাঁ, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক নির্মম ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় তবে একসাথে এতগুলো অপরাধ সংঘটিত হবার ঘটনা বিরল। কিন্তু কেন? কেন এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড? কেন এমন পৈশাচিকতা? জবাব নেই। কারো কাছে জবাব নেই। সবাই বাকরুদ্ধ। যেন কথা বলার ভাষা সবাই হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশে আজ সূর্যোদয় হয়েছিল তো? হ্যাঁ, হয়েছিল। তা না হলে রাতের আঁধার নামলো কী করে? আগামী দিন সূর্যোদয় হবে তো?

একাত্তরের ১৪ই ডিসেম্বর এই শহরের বুদ্ধিজীবিদের ধরে নিয়ে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যার পর গণকবর দেয়া হয়েছিল। একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নির্দোষ হাজার হাজার লোককে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়েছিল। পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্ট কালো রাতে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল। ৩রা নভেম্বর পঁচাত্তরে জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যার পর তাদের লাশ বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো হয়েছিল। একি তারই ধারাবাহিকতা? রাতের আধার থেকে দিনের আলোয়? পরাজিত শক্তির প্রেতাত্মার কাজ কারবার? আত্মার চেয়ে প্রেতাত্মা বেশী ভয়ংকর হলে প্রেতাত্মার চেয়ে ভয়ংকর কিছু আছে? সেই ভয়ংকর বস্তুটি একদিন একটি জাতিকেই গিলে খেয়ে ফেলবে?

সংবাদপত্রে চোখ রাখা যায় না। রেডিও টেলিভিশনে কান রাখা যায় না। কোন প্রাকৃতিক মহা দূর্যোগ নয়। মানব সন্তানের দ্বারা সৃষ্ট কর্ম কত নির্মম হতে পারে তা দেখে প্রাকৃতিও বুঝি থ মেরে আছে। কী করে তারা এমন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করলো? বিছানায় ছটফট করছে যতীন। ঘুম আসছে না তার। রেওয়াজ না বলে নিয়ম বলা যেতে পারে। নিয়মকে কটাক্ষ করে ঐতিহ্য বলা যায়। ঐতিহ্য অনুযায়ী এ ঘটনার জন্য এক বা একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তদন্ত কমিটি কয়েকদিন লাফ-ঝাপ দিবে। সে তদন্ত কমিটি ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য আর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তারপর...? তারপর ঐতিহ্য অনুযায়ী পরস্পর কাঁদা ছোড়াছুঁড়ি, দোষারোপের পালা। একদল পার্শ্ববর্তী দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে, অন্যদল তাদের দিকেই তীর নিক্ষেপ করবে। প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে না কোনদিনই। বিচার বা ন্যায় বিচার এখন শুধু আপেক্ষিক শব্দমালা। অভিধানেই কেবল তা জায়গা দখল করে আছে।

১৭ই আগষ্টের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের পর যে নাটক সাজানো হয়েছিল তা বাংলাদেশের সভ্যতা তো বটেই বিশ্ব সভ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছিল। বর্ষবরণ হত্যা যজ্ঞ? একই পথে চলে গেছে হিমাগারে। আনন্দের বিষয় হলো যে এসব ঘটনা ঘটার আগে কেউ জানতে পারে না, ঘটে গেলেও কেউ ধরতে পারে না। একেবারেই না। কেন না? কারণ এরা যাদু জানে। নেপথ্য নায়করা এতই শক্তিশালী যে সরকার এদের কেশাগ্র আইমিন চুলও স্পর্শ আইমিন ছুঁতে পারে না। এরপর এমন ঘটনা ঘটবে বা ঘটানো হবে তা হবে আগের গুলোর তুলনায় আরো বেশি ভয়াবহ যাতে নতুন ঘটনা পুরনোগুলোকে ঢেকে দিতে পারে। গল্পের শহরে গল্প রচিত হতেই থাকবে। পাঠক - পাঠিকা থাকুক বা না থাকুক।

থমকে আছে গোটা শহর, গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব। মানুষের ভিতর এমন পৈচাশিকতা বাস করতে পারে, মানুষ এমন জঘন্য কাজ করতে পারে তা ইতিহাসে স্থান পাবে। বিশ্ব বিবেক যখন এ ঘটনায় ধিক্কার জানাচ্ছে একদল লোক তখন মিছিল করছে "বিডিআর জনতা ভাই ভাই"। কারা তারা? এই নারকীয় তান্ডব দেখে তারা উল্লোসিত? আনন্দিত? আমাদেরই শহরে তারা বাস করছে আমাদেরই কাঁধে হাত রেখে? আমাদের প্রতিবেশী হয়ে? আমরা হত্যাযজ্ঞকে ঘৃনা করি, তারা সাধুবাদ জানায়? কী বিচিত্র! কি বিচিত্র এই শহর। এই শহরের লোকজন। চিন্তার রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে যতীন আর যেন একটার পর একটা ধাক্কা খাচ্ছে সে। এর শেষ কোথায়?

এলাকাটা এমনিতেই কিছুটা নিরিবিলি। তারপরেও যেটুকু কোলাহল থাকে তা-ও নেই গত দু'দিন। চোখে ঘুম আসছে না কিছুতেই। দু'চোখের পাতা এক করলেই যেন একটি ভয়াবহ দু:স্বপ্ন এসে সামনে দাঁড়ায় যতীনের। গলা টিপে ধরতে চায় একটি হিংস্র ছোবল, বল- এখনো বেঁচে আছিস কেন?

অগণিত মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসা এবং অনাকাংখিত মৃত্যুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচাকে কেমন বাঁচা বলে যতীন জানে না। সে ঘুমাতে চেষ্টা করছে। সাময়িক মরে যাওয়া আর কি।

অলংকরণ : সিকদার রহমান